# না ট ক স ম গ্র

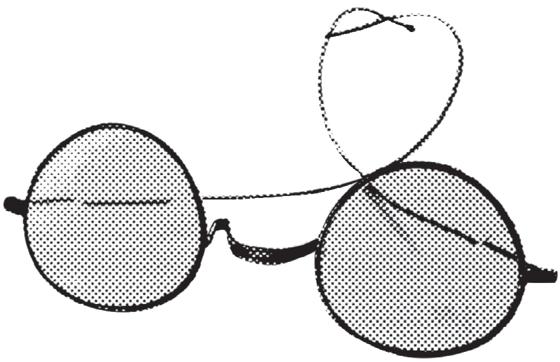

কাজী নজরুল ইসলামের ব্যবহৃত চশমা

# না ট ক স ম গ্র

নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম

TURNING THE PAGE
FOR 15 YEARS

KOBI PROKASHANI

**নাটকসমগ্র**
কাজী নজরুল ইসলাম

**প্রকাশকাল**
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২৬

**প্রকাশক**
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

**স্বত্ব**
লেখক

**প্রচ্ছদ ও অলংকরণ**
সব্যসাচী হাজরা

**বর্ণবিন্যাস**
মোবারক হোসেন

**মুদ্রণ**
কবি প্রেস
৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

**ভারতে পরিবেশক**
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

**মূল্য : ৪৫০ টাকা**

Natok Samagra by Kazi Nazrul Islam Published by
Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road
Katabon Dhaka 1205 Kobi Prokashani First Edition: September 2026
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 450 Taka RS: 450 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

**ISBN:** 978-984-2250-25-5

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অনুরাগীদের উদ্দেশে

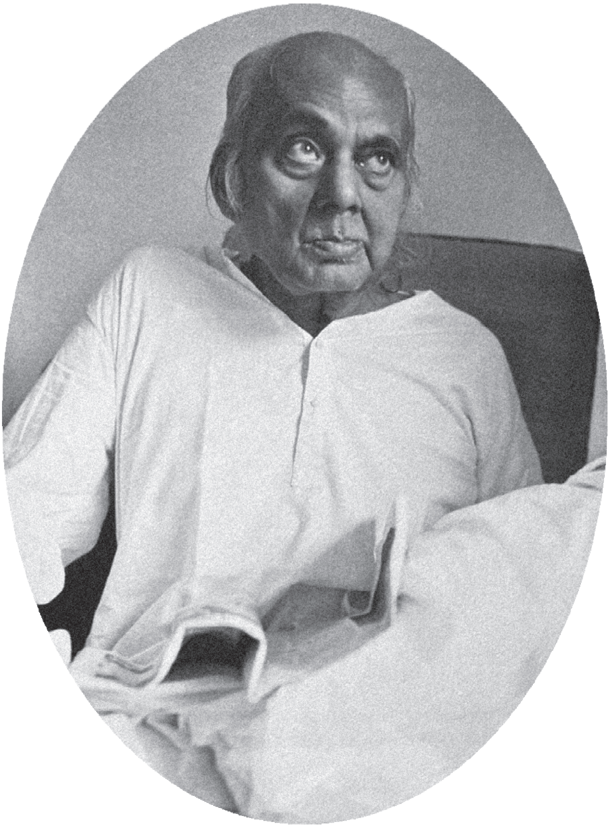

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম
(জন্ম ১৮৯৯-মৃত্যু ১৯৭৬)

# সূ চি প ত্র

ভূমিকার বদলে
নজরুলের নাটক : নীলিমা ইব্রাহিম ৯

ঝিলিমিলি ১৭
সেতু-বন্ধ ৩১
শিল্পী ৪৯
ভূতের ভয় ৫৯
আলেয়া ৭৩
মধুমালা ১১৯
পুতুলের বিয়ে ১৬৯
জুজুবুড়ির ভয় ১৮৫
কে কি হবি বল্‌ ১৮৭
ছিনিমিনি খেলা ১৮৮
কানামাছি ১৮৯
নবার নামতা পাঠ ১৯১
সাত ভাই চম্পা ১৯৩

গ্রন্থ ও রচনা পরিচিতি ১৯৭
নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি ১৯৯
নজরুল গ্রন্থপঞ্জি ২০৫

ভূমিকার বদলে

# নজরুলের নাটক

## নীলিমা ইব্রাহিম

নজরুল ইসলাম স্বভাব-কবি। কাব্য-প্রেরণাই তাঁর অন্তর-পুরুষের ও স্রষ্টামানসের মূল ভাবসম্পদ। তাঁর কাব্যপ্রতিভা যেমন তাঁকে অনবদ্য কবিতা রচনায় প্রণোদিত করেছে, ঠিক তেমনি করেই উপন্যাস, ছোটগল্প ও নাটক রচনায় প্রণোদিত করেছে। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ও গভীর অনুভূতি নিয়ে দেখলে এ সত্য-প্রকাশ সহজেই আমাদের চোখে পড়ে যে, কাব্য ছাড়া সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় তিনি যে ভাবকেই রূপ দিয়েছেন তা আঙ্গিকের দিক দিয়ে ভিন্ন রূপ নিলেও মূলত কাব্য ও গীতিধর্মী!

কবির লক্ষ্য চিরন্তন মানবাত্মা। সত্য সুন্দর ও শ্রেয়ের আকর্ষণে তার মন বস্তুবিশ্বকে অতিক্রম করে ক্ষণে ক্ষণে ছুটে চলে যায় সেই অনির্বচনীয়ের ইঙ্গিতে। তাই কিছুতে তার তৃপ্তি নেই। সে 'চঞ্চল হে, সুদূরের পিয়াসী'। বস্তুবিশ্বের নব নব রূপ-রস-গন্ধে কবি বিভোর হলেও একে সর্বস্ব করে তার শিল্প-সাধনা সীমিত থাকে না। তাই অজানাকে জানবার, খণ্ডকে অতিক্রম করে অখণ্ডকে পাবার, দেহের সীমা ছাড়িয়ে দেহাতীতের আকর্ষণ ও ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতিকে উত্তীর্ণ হয়ে ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির স্পর্শ সে পেতে চায়। এখানেই কবি-দৃষ্টির সঙ্গে দার্শনিকের মিল। তাই কবি ও দার্শনিক ধ্যানী ও যোগী। তার সাধনা শুধু মর-জগতের ভোগসর্বস্ব ইন্দ্রিয়জাত সুখের অনুভূতি নয়, তার ঊর্ধ্বলোকে অবস্থিত পরম সুন্দর ও চরম সৌন্দর্যানুভূতি লাভের সাধনা।

রবীন্দ্র-যুগে কাব্য রচনা করলেও মূলত যে মৌলিক অনুভূতি নজরুল-কাব্যকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছিল তা তাঁর মর্ত্য-মানবতাপ্রীতি ও মাটির প্রেম। মানব-অন্তরের একেবারে গহিন প্রদেশের সুগভীর সহানুভূতিপূর্ণ অনুভূতি তাঁর ছিল, তাই নজরুল-কাব্যে ভাবপ্রবণতা প্রবল বেগে প্রবাহিত হওয়া সত্ত্বেও জীবনের ব্যথা, জ্বালা ও দৈন্যের বিষ-জর্জর যন্ত্রণাকে তিনি নিপুণ শিল্পীর মতো রূপ দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর এ দুঃখ বা বেদনাবোধের চেতনা ভাবলোক-আহৃত নয়, রক্ত-মাংসে গড়া দৈন্য-পীড়িত ও ব্যথাতুর মানব-হৃদয়ের সঙ্গে একাত্মভূতির অনুভূতিজাত। এই বাস্তব রস নজরুল-কাব্যকে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য দানে সমর্থ হয়েছিল এবং এই বস্তুপ্রেমই সেদিন তাকে সর্বজনপ্রিয় কবিখ্যাতি দান করেছিল।

নজরুলের কাব্য এবং উপন্যাসে এই বাস্তব অনুভূতির স্পর্শ থাকলেও নজরুলের নাটক সে রসানুভূতি থেকে বঞ্চিত। নাটক বলতে যে বাস্তব জীবনের ছবি তার বাহ্যিক ও অন্তরলোকের দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিয়ে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, যে সুখ-দুখ-হাসি-কান্নায় আমাদের জীবন উদ্বেলিত, মন সংকুচিত, নজরুল-নাট্য-সাহিত্যে সে জীবনের সাক্ষ্য আমরা পাই না। সামাজিক মানব তার বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখ কামনা-বাসনার আকর্ষণ-বিকর্ষণ নিয়ে নজরুলের নাটকে উপস্থিত হয়নি। তাঁর নাটকের পাত্র-পাত্রী ভাবরাজ্যের অধিবাসী। মিলন-বিরহের অনুভূতি-রসে তাদের হৃদয় পূর্ণ। তাদের প্রেম-সাধনার পথ কঙ্করময়, বন্ধুর। সে পাওয়া বাস্তব দেহ-সম্পর্কিত নয়, সে পাওয়ার আকুতি হৃদয়ের আবেগ, অনুভূতিসঞ্জাত অতীন্দ্রিয় প্রেমাকাঙ্ক্ষার জন্য। তাই নজরুলের নাটক বাস্তবকে পেছনে ফেলে ভাবরাজ্যকে পটভূমিকা করে রচিত হয়েছে। তাই প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্য আলংকারিকদের নাট্যসূত্র দিয়ে তাঁর নাটকের বিচার করতে গেলে বিভ্রান্তির সম্ভাবনাই বেশি। সংস্কৃত আলংকারিকদের দৃশ্যকাব্যের সংজ্ঞা অথবা পাশ্চাত্য আলংকারিকদের drama-র definition-এর মাপকাঠিতে নজরুলের নাটকের নাটকীয়-শিল্প-চাতুর্যের বিচার চলে না। গদ্য-সংলাপ ও সংগীতপ্রাচুর্যে তাঁর গীতিনাট্যগুলো পূর্ণ, তাই সেগুলোকে drama না বলে dramatic poetry অথবা poetic drama আখ্যা দেওয়াই সমীচীন।

যেকোনো নাট্যকারের সৃষ্ট নাটকের মূল্য বিচার করতে হলে তাঁর দেশ, কাল ও সমাজের কথা স্মরণ রাখতে হবে। কারণ নাটকীয় পাত্র-পাত্রী নাট্যকারের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াতেই গড়ে ওঠে। বাংলাদেশ ভাবুকের দেশ; ভাবপ্রবণতা এ জাতির দেহ, মন, অস্থিমজ্জায় মিশে আছে। তাই বাঙালি কবি যেমন ভাবের আবেগে তাঁর উচ্ছ্বাস-প্রবণ হৃদয় নিয়ে কাব্য সৃষ্টি করেছেন, উপন্যাস অথবা নাটক রচনার সময়েও নিজেকে সে-ভাবাবেগ থেকে মুক্ত করতে পারেননি। তাই বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ নাটকই ভাবাবেগের আতিশয্য-দুষ্ট হয়ে থাকে।

নজরুলের নাটকও এর ব্যতিক্রম তো নয়ই, এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মাত্রাতিরিক্ত ভাবাবেগ ও অত্যধিক রোমান্সপ্রবণতার জন্য নজরুলের গীতিনাট্যগুলো Melodrama-য় পর্যবসিত হয়েছে। নাটকীয় রবীন্দ্রনাথের রূপক ও সাংকেতিক নাটকগুলোর প্রভাব তাঁর ওপর লক্ষ করা যায়। রূপকধর্মিতার জন্য নাটকীয় পাত্র-পাত্রীরা প্রাণধর্ম বঞ্চিত—নাট্যকারের হাতের ক্রীড়নকরূপে বিচরণ করেছে। তাদের ব্যক্তিসত্তার পেছনে পরিচালকের হস্তক্ষেপ স্পষ্টই লক্ষ করা যায়। আত্মচেতন গীতিকবি-মানস নাট্যকারের মুখ্যধর্ম নৈর্ব্যক্তিকতাকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়নি, অথবা চেষ্টাও করেনি। তাঁর ভাবের আতিশয্যে তিনি ভেসে গেছেন তাঁর কাব্য-প্রেরণার স্রোতে।

নজরুলের রচিত গীতিনাট্যগুলো অধিকাংশই একাঙ্কিকা। তিন অঙ্কে রচিত 'মধুমালা' ও 'আলেয়া'ই পূর্ণ নাটকের রূপ ও অঙ্গ কিছুটা গ্রহণ করেছে। ১৯৪৪ সালে নজরুল ইসলামের গীতিনাট্য 'আলেয়া' নাট্য-নিকেতনে অভিনীত হয়।

'আলেয়া' রূপক নাটক। কয়েকটি চরিত্রের মাধ্যমে মানব-জীবনের শাশ্বত অনুভূতিগুলোকে রূপ দেওয়া হয়েছে এবং নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার তাঁর মূল বিষয়বস্তুর ভাব-স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। নাটকের মূল ভাব সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

> এই ধূলির ধরায় প্রেম ভালোবাসা—আলেয়ার আলো। সিক্ত হৃদয়ের জলাভূমিতে এর জন্ম। ভ্রান্ত পথিককে পথ হ'তে পথান্তরে নিয়ে যাওয়াই এর ধর্ম। দুঃখী মানব এরই লেলিহান শিখায় পতঙ্গের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। তিনটি পুরুষ, তিনটি নারী—চিরকালের নর-নারীর প্রতীক—এই আগুনে দগ্ধ হ'লো—তাই নিয়ে এই গীতি-নাট্য।

'আলেয়া'র কাহিনি কবির এর পরবর্তী নাটক 'মধুমালা' অপেক্ষা দৃঢ়-সংবদ্ধ এবং তাতে নাটকীয় সূত্রের ঐক্য অনেকখানি রক্ষিত হয়েছে। 'আলেয়া' রূপক নাটক, সুতরাং তার মুখ্য পাত্র-পাত্রীরাও মানব-জীবনে বিভিন্ন অনুভূতির প্রতীক। প্রেমাকাঙ্ক্ষী চিত্তের প্রতীক মীনকেতু। নারীর 'রূপ-যৌবনের উচ্ছল ঝর্ণাধারায়' তার চিত্ত বিক্ষুব্ধ ও আলোড়িত। নারী-সৌন্দর্য তাকে শুধু মুগ্ধ করেনি, সম্মোহিতও করেছে। তার কাছে রাজ্য-সাম্রাজ্য প্রভাব-প্রতিপত্তি ঐশ্বর্য সবই তুচ্ছ। তাই মীনকেতু কৃষ্ণাকে বলেছে, 'সুন্দরের কাছে রাজমহিমা দেখানোর মতো হাসির জিনিস আর কিছু কি আছে?' এ যেন কবিচিত্তে সৌন্দর্য-পিপাসার যে আকুল আকুতি ছিল, তারই প্রতিধ্বনি। কবির শিল্পমনের রস-চেতনা ও সৌন্দর্য ভোগের কামনা থেকেই 'মীনকেতু'র উদ্ভব ও সৃষ্টি।

কৃষ্ণা চরিত্র নাটকীয় পরিবেশে সৃষ্টি ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতে অনেকখানি সহায়তা করেছে। তার অন্তরের দ্বৈত অনুভূতি—একদিকে শক্তি, সৌন্দর্য ও বিরাটত্বের প্রতি আকর্ষণ, অন্যদিকে চন্দ্রকেতুর প্রেমের প্রতি মানসিক দুর্বলতা তাকে অনেকখানি জীবন্ত ও স্বাভাবিক করে তুলেছে। তার হৃদয়ের আত্মিকসত্তার অন্তর্দ্বন্দ্ব 'আলেয়া' নাটককে অনেকখানি শিল্পচাতুর্য দান করেছে। চন্দ্রকেতুকে কৃষ্ণা বলেছে—

> দুঃখ কোরো না বন্ধু, তোমায় বুকের প্রেম দিতে পারিনি বলেই ত চোখের জল দিই। আমি নারী, আমি জানি, হৃদয়হীনতা দিয়ে হৃদয়কে যত আকর্ষণ করা যায়, তার অর্ধেকও হয়তো ভালোবাসা দিয়ে আকর্ষণ করা যায় না। আমি ভালোবাসা পাইনি, তুমিও ভালোবাসা পাওনি—এইখানেই ত আমরা বন্ধু! কিন্তু তুমি ত আমার চেয়েও ভাগ্যবান। আমি যে কাউকে ভালোবাসতেই পারলুম না তুমি ত তবু একজনকে ভালোবাসতে পেরেছ।

নারী-হৃদয়ের চির-রহস্যে ঘেরা প্রেমের অনুভূতিকে নাট্যকার কৃষ্ণা চরিত্রে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। কৃষ্ণার ভেতর রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র নন্দিনীর অনুভূতিকে কিছুটা আমরা উপলব্ধি করি। নন্দিনী যেমন শক্তির প্রতীক রাজার প্রতিও আকর্ষণ অনুভব করেছে, আবার রঞ্জন, বিশু আর কিশোরের জন্যও তার হৃদয়ের দ্বার অর্গল-মুক্তই ছিল। উগ্রাদিত্য মানবের পৌরুষ-জনোচিত পশুসত্তার প্রতীক। উগ্রাদিত্য নিজের পরিচয় দিয়েছে—

'ভূতের ভয়'-এ দেশপ্রেমিক বিদ্রোহী কবিকে খুঁজে পাই। স্বদেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করবার জন্য কবি বিপ্লবের গান গেয়েছেন। তাঁর উপন্যাস 'কুহেলিকা', 'মৃত্যুক্ষুধা'র নায়কের মনে যে পরাধীনতার জ্বালা অনুভূত হয়েছিল, যে বিষদহন তাঁদের ঘরছাড়া করেছিল, সেই একই বিপ্লবী মন্ত্র প্রতিধ্বনিত হয়েছে এ নাটিকায়। বিদ্রোহী, বিপ্লবী কবি-আত্মা শান্তির নামে জড়তাকে গ্রহণ করতে পারেননি; তাই গেয়েছেন :

মোরা মারের চোটে ভূত ভাগাবো, মন্ত্র দিয়ে নয়,<br>
মোরা জীবন ভরে মার খেয়েছি, আর প্রাণে না সয়।

'শিল্পী' নাটিকাতেও কবির নিজস্ব জীবনতত্ত্ব ও তাঁর ব্যক্তিমানসই আত্মপ্রকাশ করেছে।

'পুতুলের বিয়ে' কয়েকটি কবিতাপূর্ণ নাট্যকাব্য; এ-কাব্যখানি কবির শিশু-সুলভ সরলচিত্তের অভিব্যক্তি। শিশু-অন্তরের অনুভূতিতে একান্ত দরদী মনে আপনার করে নিয়ে কবি অপূর্ব ছড়া ও গজলে এ গীতিনাট্যখানি মুখর করে তুলেছেন। অবশ্য কোথাও কোথাও কাব্যোচ্ছ্বাসে সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায়। যেমন শিশুদের জন্য রচিত কাব্য অকস্মাৎ পরিণত মনের উপযোগী হয়ে পড়েছে। যথা—

মিলন-গোধূলি রাঙা হয়ে এলো ঐ<br>
সোনার গগনময়।<br>
দাও আশিস অভয়, হে দেব জ্যোতির্ময়।

দৃশ্যকাব্য অথবা drama-র সংজ্ঞা দিয়ে নজরুলের নাটককে বিচার করা চলে না, এ কথা আমি আগেই বলেছি। অনুভূতিপ্রবণ কবিহৃদয়ের আবেগোচ্ছ্বাসে নজরুলের গীতি-নাট্যগুলো এক বিশেষ রসের সৃষ্টি করেছে। নাটকীয় শিল্পরীতি অপেক্ষা সংগীত-মাধুর্য ও কাব্যরসের সমৃদ্ধিই এর প্রাণ-সম্পদ বৃদ্ধি করেছে।

তবে নজরুলের গীতিনাট্যগুলো একেবারে ত্রুটিশূন্য নয়, এ কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। কাহিনির শৈথিল্য, নাটকীয় চরিত্রগুলোতে অন্তর্দ্বন্দ্বের অভাব, নাট্যসূত্রের (dramatic live) দৃঢ়তার অভাবও নাটকগুলোতে লক্ষ করা যায়। কিন্তু নিখুঁত নৈপুণ্য না থাকলেও কাব্য ও সংগীত সুষমা এ নাটকগুলোকে রসোত্তীর্ণ করেছে। এই গীতিনাট্যগুলো নজরুল-প্রতিভার অন্যতম সার্থক শিল্পসৃষ্টি।

মঞ্চে পূর্ণ সার্থকতা অর্জন না করলেও পাঠ্য নাটকরূপে এ গীতিনাট্যগুলো বাংলা সাহিত্যের সম্পদরূপেই রক্ষিত হবে।

*নজরুল সাহিত্য* (সম্পা. আবুল হোসেন)

# ঝিলিমিলি

## প্রথম দৃশ্য

[মির্জা সাহেবের দ্বিতল বাড়ির ওপর-তলার প্রকোষ্ঠ। মির্জা সাহেবের ষোড়শী মেয়ে ফিরোজা রোগশয্যায় শায়িতা। সব জানালা বন্ধ, শুধু পশ্চিম দরজা খোলা। বাহিরে বৃষ্টি হইতেছে। পার্শ্বে বসিয়া মির্জা সাহেবের পত্নী হালিমা বিবি মেয়েকে পাখা করিতেছেন। বাদলায় ও বেলাশেষের অন্ধকারে ঘরের আঁধার গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল। হালিমা বিবি উঠিয়া হারিকেন জ্বালিলেন!]

ফিরোজ : মা!

হালিমা : (ছুটিয়া আসিয়া ফিরোজার মুখের কাছে মুখ রাখিলেন) কি মা! সোনা আমার!

ফিরোজা : বাতি নিবিয়ে দাও!

হালিমা : কেন মা? বড্ডো আঁধার যে! ভয় করবিনে।

ফিরোজা : উঁ হুঁ। তুমি আমায় ধরে বসে থাকো। (মাকে জড়াইয়া ধরিল।) বাতি বিশ্রী লাগে।

হালিমা : তা ত লাগবেই মা! (দীর্ঘ-নিঃশ্বাস গোপন করিলেন।) আচ্ছা, আমি কাগজ আড়াল করে দিই। কেমন?

ফিরোজা : না। তুমি নিবিয়ে দাও। (রোগীশীর্ণ কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল।) দাও শিগ্‌গির!

হালিমা : কেঁদো না মণি, মা আমার! এই আমি নিবিয়ে দিচ্ছি। (বাতি নিবাইতে গেলেন। ততক্ষণে কতকগুলো বাদ্‌লা পোকা আসিয়া বাতি ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছিল। ফিরোজা তাহাই এক মনে দেখিতে লাগিল।)

ফিরোজা : নিবিয়ো না, মা! আমি বাদলা পোকা দেখব।

হালিমা : (হাসিয়া ফিরিয়া আসিলেন) খ্যাপা মেয়ে! আচ্ছা নিবাব না। পোকা যে গায়ে-মুখে এসে পড়বে মা, বাতিটা একটু সরিয়ে রাখি।

ফিরোজা : (চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।) না! আমি বল্‌ছি, বাদ্‌লা পোকা দেখব!

হালিমা : (কন্যাকে চুমু দিলেন) লক্ষ্মী মা আমার! অত জোরে কথা কোয়ো না! ওতে অসুখ বেশি হয়! আমি বাতি সরাচ্ছিনে।

ফিরোজা : (চুপ করিয়া বাদ্‌লা পোকা দেখিতে লাগিল।) মা, আমায় একটা বাদ্‌লা পোকা ধরে দাও না!

হালিমা : ছি মানিক! পোকা ছুঁতে নেই। তুই আজ অমন করছিস্ কেন ফিরোজা?

ফিরোজা : (কান্না সুরে) দাও বলছি। নৈলে চেঁচিয়ে রাখবো না কিছু।

হালিমা : লক্ষ্মী, মা! কেঁদো না। এই দিচ্ছি। (একটা বাদ্‌লা পোকা ধরিয়া মেয়ের হাতে দিলেন। ফিরোজা হাতে করিয়া এক মনে বাদ্‌লা পোকা দেখিতে লাগিল।)

ফিরোজা : এই যা! পাখা খসে গেল! আ-হা রে! আচ্ছা মা! বাদ্‌লা পোকার খুব লাগল?

হালিমা : তা লাগল বৈকি!

ফিরোজা : তা হলে ছেড়ে দিই ওকে। মা, তুমি ওকে নিচে রেখে এসো (হালিমা বাদ্‌লা পোকা নিচে রাখিয়া আসিলেন।)... মা, বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, না?

হালিমা : হাঁ মা, খুব বৃষ্টি। শুন্‌ছ না ঝমঝমানি?

ফিরোজা : আমার খুব ভালো লাগে ঐ বৃষ্টির শব্দ।... মা, আব্বা* কোথায়?

হালিমা : বাইরে, দহলিজে** বোধ হয়।

ফিরোজা : এখন যদি আমি খুব জোরে কাঁদি, আব্বা শুনতে পাবেন?

হালিমা : ছি মা, কাঁদবে কেন? ওঁকে ডেকে পাঠাব?

ফিরোজা : না, না, ডেকো না। মা খুব লক্ষ্মী মেয়ে। আচ্ছা মা, তুমি যদি এখন গান করো, আব্বা শুনতে পাবেন?

হালিমা : ওরে দুষ্টু! বুঝেছি তোমার মতলব।... না, মা, এখন কি আর গান করে? তোর আব্বা শুনলে রাগ করবেন।

ফিরোজা : এত বৃষ্টিতে শুনতে পাচ্ছেন কি না! মা, লক্ষ্মী মা, সোনা-মা, আস্তে আস্তে গাও না! সেই বৃষ্টি ঝরার গানটা।

হালিমা : আচ্ছা, গাচ্ছি আস্তে আস্তে। এখন কি আর গান আসে রে ফিরোজা। সে কখন ছেলেবেলায় গেয়েছি গান। এখানে এসেই তা ভুলতে চেষ্টা করেছি। তোর আব্বা বড্ডো রাগ করেন গান শুনলে।

ফিরোজা : আচ্ছা মা, গান শুনেও কেউ রাগে? আব্বা আচ্ছা মানুষ যা হোক।

হালিমা : আগে কিছুদিন রাগ করতেন না।...গান ত প্রায় ভুলেই যাচ্ছিলাম। কেবল তোর জন্যেই আজো দু-একটা মনে আছে।

ফিরোজা : আব্বা আগে রাগ করতেন না মা, তুমি গান করলে?

হালিমা : না...তুই এখন গান শোন্।

ঝরে ঝরঝর কোন্ গভীর গোপন-ধারা এ শাঙনে।
আজি রহিয়া রহিয়া গুমরায় হিয়া একা এ আঙনে ॥

---

* আব্বা—বাবা। ** দহলিজ—বাহির-বাটী।